

উম্মাহ'র নেতাদের প্রয়োজনীয় গুণাবলীঃ ভূমিকা

ইসমাঈল বিন আব্দুর রহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অসহায়দের সাহায্যকারী, তাওহীদবাদীদের সম্মানীতকারী এবং কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতাকারী। দূরুদ ও সালাম তাওহীদবাদীদের ইমাম ও মুজাহিদদের নেতার প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার নির্দেশিত পথে চলবে তাদের প্রতি। নিশ্চয়ই সর্বাধিক সত্যবাদী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ নবী মুস্তফা (সা.) এর পথ।

অতঃপর: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন স্ব-স্ব কওমকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। মিথ্যা, জুলুম ও অত্যাচারের অন্ধকার থেকে ইনসাফ, দয়া, উত্তম চরিত্র ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধের দিকে নিয়ে আসার জন্য।

যেমনটা রিবঈ ইবনে আমের (রা.) বলেছেন: “আমরা এমন সম্প্রদায়, আমাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন বান্দাদেরকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে বের করে বান্দার রবের দাসত্বের দিকে নিয়ে আসার জন্য, সকল ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে আসার জন্য।” (ইবনে কাসীর রাহি. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- তে উল্লেখ করেছেন। এর সনদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।)

এগুলো অল্প কিছু কথা, কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। কারণ এতে তিনি সেই মহান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা আখিরী উম্মাহর উপর অর্পণ করেছেন। আর তিনি এই উম্মাহর জন্য যে পথ নির্ধারণ করলেন তা হচ্ছে “মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসা।”

এবার আমরা দেখি, আমাদের অবস্থা কি? আমরা তো দেখছি, আমাদের উম্মাহর অনেক লোক সে পথ থেকে বের হয়ে গেছে, ফলে তারা নিজেরাও বক্র হয়েছে, অন্যদেরকে বক্রপথে নিয়ে গেছে এবং ধোঁকা, জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তার নবী মুহাম্মদ (সা.) কে এমন এক যুগে প্রেরণ করেছেন, যে যুগ দেখেছে এমন জুলুম, পথভ্রষ্টতা ও শিরক, যার উপমা পৃথিবী কখনো দেখেনি এবং দেখবেও না। সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) ধরাতলে আগমন করলেন ইসলামের বার্তা, তাওহীদের নূর ও হিদায়াত নিয়ে। ঈমানী বন্ধনের ভিত্তিগুলো স্থাপন করার জন্য। তিনি (সা.) ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলোকে সঠিক করলেন। সমাজকে পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা, জুলুম ও মূর্থতার অন্ধকার থেকে ইনসাফ, দয়া ও সাম্যের দিকে নিয়ে এলেন, যাতে কোনো আরবীয়র জন্য অনারবীয়র উপর তাকওয়া ছাড়া কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ফলে এটা সেই মর্যাদাকর বিষয়ে পরিণত হলো, যার ব্যাপারে সমস্ত সৃষ্টি প্রতিযোগিতা করবে, তথা তাকওয়া, আল্লাহর নৈকট্য ও তার সরল দ্বীনের শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়ন। এর মাধ্যমেই নবী (সা.) তার সাহাবীদেরকে সার্বিকভাবে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিলেন। যার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের দিকও। একারণেই ইতিহাস আজ পর্যন্ত তাদের মত

নেতৃত্বদানকারী ও পরিচালনাকারী দেখেনি। আর এমনটা হবে না কেন? তারা তো আদম সন্তানের সর্দার, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী নবীর হাতে শিক্ষা লাভ করেছেন। নবী (সা.) এর নেতৃত্ব ছিল প্রকৃত অর্থেই অতুলনীয় নেতৃত্ব। তার নেতৃত্বের প্রশংসা করার মত কি যোগ্যতাই বা আমার আছে? তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের ভিত্তিকে এমন একটি কাঠামোর উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার বর্ণনা কোন মানুষ দিতে অক্ষম। ফলে অল্প দিনের মধ্যে সবরকম অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে ফেললেন। তার সমাজকে এমন আদর্শ ও সুসভ্য সমাজ হিসেবে গড়ে তুললেন, যা সামাজিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ স্তর লাভ করেছিল। অনুরূপই ছিল তার বহিঃরাষ্ট্রনীতিও। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী কিছু গোত্রের সাথে মিত্রতা গঠন করলেন এবং কিছু গোত্রের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলেন। তিনি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিত তার দূতদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে মনোনীত করতেন।

তাই আমার ইবনে আস (রা.) কে আম্মানের বাদশাহর প্রতি দূত হিসেবে মনোনীত করলেন। হাতিব ইবনে আবি বালতাআ (রা.) কে মিশরের বাদশা মুকাউকিসের প্রতি দূত হিসেবে মনোনীত করলেন। নিজের জন্য একটি আংটি বানালেন, যেন তাঁর যুগের অন্যান্য বাদশাহদের সাথে মিল রাখতে পারেন। তিনি (সা.) যখন মদীনার বাইরে যেতেন, তখন মদীনার কার্যনির্বাহী পরিচালনার জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কাউকে শাসক বানাতেন। এই ধারাবাহিকতায় একবার আলী (রা.) কে শাসক বানালেন, একবার উসমান (রা.) কে শাসক বানালেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র দল বা বড় বাহিনীর জন্য উদ্দিষ্ট শহর বা কওমের বংশ বিবেচনা পূর্বে এবং নিজ সাহাবীদের যোগ্যতার ব্যাপারে স্বীয় ধারণার আলোকে কোনো উপযুক্ত লোককে আমীর বানাতেন।

এজন্য একবার আমীর বানিয়েছিলেন আবু বকরকে, একবার আলীকে, আবার কখনো আমার ইবনুল আসকে, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বা উসামা ইবনে যায়দকে (অথচ তিনি বয়সে অনেক ছোট ছিলেন)। যে সাহাবী যে প্রাকৃতিক বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতেন, তিনি তাঁর সেই গুণটিকে আরো বাড়িয়ে তুলতেন। প্রত্যেককে সেই গুণের আলোকে কোনো উপাধি দিতেন। তারপরে তাকে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন, যা ঐ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার প্রতি তাঁর আত্মবিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করত। হ্যাঁ, তা ছিল এমন এক শিক্ষা, যা পৃথিবী পূর্বেও কখনো দেখেনি এবং পরেও দেখবে না। যে শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগকে সর্বকালের সেরা যুগে পরিণত করেছিল। তাই আমি সেই যুগের যতই প্রশংসা করি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যতই বর্ণনা করি, কখনো তা শেষ করতে পারব না। আজ মুসলিমদের নেতৃত্ব ঠিক সেভাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে গড়ে তুলেছিলেন। বিশেষত: যেহেতু আমরা এমন এক জামানায় নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েছি, যখন ফিতনার ঢেউ ঢেউয়ের ন্যায় একটির ওপর আরেকটি আছড়ে পড়ছে। উম্মাহ আজ এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে, যা তাদেরকে সেই বিভেদ, দলাদলি, হিংসা, হানাহানি, বিভ্রান্তি, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও জুলুম থেকে মুক্তি দেবে, যা খিলাফতের পতন, অতঃপর বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে সকল দেশগুলো ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হওয়ার পর থেকে অধিক পরিপুষ্ট হয়েছে। এই উম্মাহর আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন এক নেতৃত্বের, যা হবে প্রজ্ঞাশীল, কুরআন-সুন্নাহর আলিম। তাঁর জাতি যে পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করবে। অতঃপর তাঁর বিরুদ্ধে অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকেও তাঁর আলোকে চিন্তা করবে।

যেটা নবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন: “অচিরেই সকল জাতি-গোষ্ঠী পরস্পরের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করবে, যেমন খাবারের

প্লেটে একজন আরেকজনকে আহ্বান করে। একজন বলল, সে দিন আমাদের সংখ্যা কম থাকার কারণে এমনটি হবে? রাসূল (সা.) বললেন: বরং সে দিন তোমরা অনেক বেশি থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে প্রবহমান আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নেবেন আর তোমাদের অন্তরে ওয়াহন ঢেলে দেবেন। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ওয়াহন কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।” (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ, শায়খ আলবানি তাকে সহীহ বলেছেন)

এই নেতৃত্বের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো উম্মাহর প্রতিটি সদস্য, দল ও অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষণ প্রদান, উম্মাহর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন উন্নয়নশীল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যত বেশি সম্ভব উলামা, চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক ও জিহাদী নেতৃত্বকে একত্রিত করা এবং এমন অনেক সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে, যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহর আলোকে এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে, জীবনের সকল বিষয়ে যার থেকে সমাধান নেওয়া হবে।

যে সকল বিষয় বুঝা কখনো কখনো কারো জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, সেগুলোতে উম্মাহর পূর্বসূরিদের বুঝের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। যেন সর্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ এমন একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, যার লক্ষ্য হবে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুয়্যাহ ফিরিয়ে আনা এবং ‘ইনিল হুকুম ইল্লা লিল্লাহ’ পুনরায় বাস্তবায়ন করা।

ইসলামে নেতৃত্বের প্রতিপালন

ইসলামে প্রতিপালনমূলক নেতৃত্ব কোনো চাকরি বা ক্ষমতা নয়। বরং এটি জীবনের একটি আদর্শ। জীবন পরিচালনার পদ্ধতি। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে খিলাফত বাস্তবায়ন করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, তার আদেশগুলো পালন করা এবং তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা। এর দ্বারা নেতৃত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গি আর পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা সেখানে যারা দুনিয়া-আখিরাত উভয়ের জন্য কাজ করে আর যারা শুধু দুনিয়ার জন্য কাজ করে, এই দুই শ্রেণীর মাঝে বিস্তর ব্যবধান থাকে। একারণে প্রত্যেক সংজ্ঞা দানকারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও সামগ্রিক পরিবর্তনশীল উপাদানগুলোর কারণে এর সংজ্ঞার মধ্যেও পার্থক্য হবে। যেমন- পরিপার্শ্বিকতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এবং অভীষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য হয়।

উম্মাহর জন্য নেতৃত্ব, দেহের জন্য আত্মার ন্যায়। এটি এমন জিনিস, যা দেহকে নাড়া দেয়, তাতে আনন্দ ও প্রশান্তির অনুভূতি দেয়। এমন জিনিস, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অধিক ব্যথিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের অনুভূতি দেয়। তাই উম্মাহর নেতৃত্বই হচ্ছে তার দেহের প্রধান পরিচালক। নেতৃত্বই তাকে আশঙ্কাজনক বিষয় থেকে দূরে থাকার দিকনির্দেশনা করে এবং দেহকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ রক্ষণাবেক্ষণ করে। যেন উম্মাহর জীবন সর্বোত্তমভাবে পরিচালিত হয়।

রাসূল (সা.) বলেন: পরস্পর দয়া, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে দেখবে একটি দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে তার জন্য পুরো দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে কাটায়। (ইমাম বুখারি রাহি. সহীহ বুখারিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

উম্মাহর জন্য আজ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃরাজনীতিতে প্রজ্ঞাবান একটি নেতৃত্বের প্রয়োজন। যা প্রতিটি বিষয়কে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক স্থানে রাখবে। যেন উম্মাহর সন্তানদের মাঝে শারঈ শাসনব্যবস্থার প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে। যা এক শ্রেণীর অঙ্কদের কর্মকাণ্ডের কারণে অনেকের কাছেই ভয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উম্মাহ প্রতীক্ষা করছে, কে তাদেরকে শত্রুদের কবল থেকে এবং উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী তাগুত শাসকদের কবল থেকে তাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিবে। যারা তাদেরকে যুগ যুগ ধরে শাসন করে আসছে।

উম্মাহ অনেক বেশি প্রয়োজনবোধ করছে এমন এক নেতৃত্বের, যা তাদের ওপর সহনশীল হবে, তাদের প্রতি কোমল হবে, তাদের সাথে নম্রতা ও ভালোবাসার আচরণ করবে এবং তাদের প্রতি দয়াশীল হবে আর তাদের শত্রুদের প্রতি হবে কঠোর। যেমন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

‘মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়াদ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে (কখনই) রুকুতে, (কখনই) সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সমুষ্টি সন্ধান রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে। এই হল তাদের সেই গুণাবলী, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপরে তাকে শক্ত করল। তারপরে তা পুষ্ট হল। তারপরে তা নিজ কাণ্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, তা কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে ফেলে। ওটা এটার জন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।’ (আল-ফাতহ ২৯)

এমন নেতৃত্ব, যা জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মান ও মূল্যায়ন করবে; তাকে উপহাসের বস্তু বানাবে না। যেমন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

‘(হে নবী!) তারপরে আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্বরূন তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রুঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু’আ কর এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে থাক। অতঃপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) মনস্থির করবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।’ (আলে ইমরান: ১৫৯)

সকল মানুষের সাথে কোমল আচরণ করা ইসলামের একটি উন্নত বৈশিষ্ট্য। এমন ব্যক্তিই এই গুণে গুণান্বিত হতে পারে, ঈমান যার হৃদয়ে গভীরে প্রবেশ করেছে, চেতনায় ও কর্মে দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়ে ফেলেছে। যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে যে, কোমলতাই সৌভাগ্য, শ্রেষ্ঠত্ব নেতৃত্বটির চাবিকাঠি। উম্মাহ আজ কতই না প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এমন একটি নেতৃত্বের, যে তাদের সাথে কোমল আচরণ করবে, তাদেরকে নতুন করে জেগে উঠতে সাহায্য করবে!!

আবুদ্বারদা (রা.) এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যাকে তার কোমলতার ভাগ দেওয়া হয়েছে, তাকে তার কল্যাণের ভাগ দেওয়া হলো। আর যাকে তার কোমলতার ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে তার কল্যাণের ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হলো। কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে তার উত্তম চরিত্র।” (বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ও তিরমিযি)

ইসলাম আমাদেরকে কোমলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, তার দিকে আহ্বান করেছে ও উৎসাহিত করেছে। ইসলাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছে যে, যে ব্যক্তি কার্যগতভাবেই কল্যাণের প্রেমিক ও তার প্রতি আগ্রহী হয়, কোমলতার প্রভাব ও ফলাফল তাকে সকল কর্মকাণ্ডে কোমলতা অনুসন্ধান করতে বাধ্য করবে। সুতরাং কোমলতা হলো, সকল আমলের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বল্য। যা তার শ্রেষ্ঠত্বের একটি রহস্যও বটে। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, “নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার প্রতিদান হিসেবে এমন বিষয় দান করেন, যা কঠোরতার দ্বারা দান করেন না। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রাহি.)

আমি পূর্বে মুসলিম নেতৃত্বের গুণাবলীর সম্পর্কে একটি কিতাব লিখেছি। এখানে উক্ত কিতাবে উল্লেখিত গুণগুলোর ওপর আরও দুইটি গুণ বর্ণনা করবো। গুণ দুইটি হচ্ছে: ‘বীরত্ব’ ও ‘পরামর্শ করা’। আল্লাহর এই মুখাপেক্ষী বান্দার অভিমত হচ্ছে, এই গুণগুলো এমন গুণ, যা একজন মুক্তিদাতা নেতার (যদি উপাধিটি সঠিক হয়ে থাকে) মাঝে বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত জরুরী।

উক্ত গুণগুলো হচ্ছে - ইলম, সহনশীলতা, প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা, দানশীলতা, বাগ্মিতা, বীরত্ব, পরামর্শ ও সত্যতা। যদিও আরও অনেক গুণাবলী রয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি, এগুলো হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কিতাবের বাক্যে বাক্যে এসকল গুণগুলোর প্রতিটির স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করবো ইন শা আল্লাহ।